মাতৃভাষা দিবসের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান (টোকিও)

বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা দিবস ও সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপটে ভিন্নতা রয়েছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা তা অনেক সময় উপলব্ধি করি না। আমাদের কাছে একুশ অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও বিশ্বের অনেক অঞ্চলের মানুষের কাছে এর আবেদন এখনো অস্পষ্ট। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলো টোকিওর শহীদ মিনার পার্কে, একুশে ফেব্রুয়ারীতে। সেখানে ভিড় জমিয়েছিলো জাপানী ও বেশ কয়েকটি দেশ থেকে আগত বিদেশীরা। অনুষ্ঠানের উন্মুক্ত সংলাপ পর্বে জাপানী উপস্থাপিকা আর এক জাপানীকে প্রশ্ন করলো, মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে তুমি কি জানো। উত্তর এলো, জাপানে মাতৃভাষা বলে কিছু নেই, আছে রাষ্ট্রভাষা। কথাটা ঠিক। জাপানের স্কুলে ভাষা শিক্ষার ক্লাসকে জাপানী ভাষার ক্লাস বলে না, বলা হয় কোকু-গো অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষার ক্লাস। প্রশ্নকর্তা নাছোড় বান্দা দেখে উত্তরদাতা একটু আমতা আমতা করে বললো, তার বাড়ী জাপানের উত্তর অঞ্চলের আওমরি জেলায়। সেখানে সুগারু ডায়ালেক্ট প্রচলিত যা অন্যান্য অঞ্চলের জাপানীদের কাছে অবোধ্য। সে মনে করে সুগারুই তার মাতৃভাষা এবং টোকিওতে এসে মাতৃভাষাকে সে খুব অনুভব করে। পাশে বাংলাদেশের এক রসিক সিলেটি প্রবাসী টিপ্পনি কাটে- আমার মাতৃভাষা সিলেটি তবে রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে বাংলা! পরের উত্তরদাতা এক ফিলিপিনা জানালো, দ্বীপপুঞ্জের দেশ ফিলিপিনে রয়েছে প্রায় ১৭০টি ভাষা। যে দ্বীপটিতে তার জন্ম, সেখানকার মাতৃভাষার নাম বাইকল ভাষা। মাতৃভাষা তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ তবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত তাগালোগ ভাষা তার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। এর পরের উত্তরদাতা কোলকাতা থেকে আসা এক বাঙালী। মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে সে ভাবিত নয়, কারণ প্রতিবেশী বাংলাদেশ রয়েছে।

একুশ আমাদের ভাবায়। উনিশশো আটচল্লিশ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা ছিলো- একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সে ঘোষণায় মাতৃভাষার উল্লেখ ছিল না। তারপর শুরু হলো ভাষা আন্দোলন, একুশ থেকে একাত্তরে এসে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হলো বাংলা । সেখানেই থামা নয়, উনিশশো নিরানব্বই সালে একুশের বিশ্বায়ন ঘটলো। বিশ্ব কিন্তু একুশের নামকরণ করলো মাতৃভাষা দিবস, রাষ্ট্রভাষা দিবস নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে একুশ নিয়ে যা হচ্ছে, ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধায় আনত হওয়া, ভাষা সৈনিকদের প্রয়ানে মুহ্যমান হওয়া বা সর্বস্তরে বাংলা চালু করায় প্রত্যয়ী হওয়া- তার অধিকাংশই জাতীয় চেতনার প্রতিফলন। আমাদের জাতীয় চেতনার আবার দ্বৈত সত্তা রয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমরা যখন শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণ করি তখন আমাদের বাঙালী জাতীয় চেতনা বিমূর্ত হয়ে ওঠে। আবার আমরাই যখন ছাব্বিশে মার্চে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্প অর্পণ করি, তখন ফুটে ওঠে আমাদের বাংলাদেশী জাতীয় চেতনা। আমরা একই সাথে বাঙালী এবং বাংলাদেশী। আমাদের এই দ্বৈত জাতীয় চেতনা সংহত হতে সময় লাগছে, কিছু সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে সংশয়ে। অথচ আত্মচেতনা সংহত হবার আগেই আমরা একুশকে তুলে দিলাম বিশ্ববাসীর কাছে। বিদেশের মাটিতে নির্মিত শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে যখন দেখি, কিছু অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে নানা দেশের মানুষ একুশকে হৃদয়ে ধারণ করতে চাইছে, তখন কি করা? আমরা কি ওদের একুশের গান গাইতে বলবো, হাতে ধরিয়ে দেবো অশ্রুসিক্ত ক্রিসেন্থেমাম কিংবা চেরী ফুল ?

ফুল ফুলে ছেয়ে গেছে টোকিও শহীদ মিনার প্রাঙ্গন। এক জাপানী বন্ধু বলে ভাষার জন্য এত ভালবাসা কখনো দেখিনি। আমিও লাল ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। জাপানে শোকের ফুলের রঙ সাদা আর ভালবাসার ফুলের রঙ লাল। শহীদ মিনারে আমাদের দেওয়া ফুলের রঙ লাল, কারণ তার সাথে শহীদের রক্তের রঙের মিল রয়েছে। এটা যে ভালবাসার রঙ তা কখনো ভাবিনি। এক জাপানী বন্ধু আমার হাতে দৈনিক আসাহি সংবাদপত্রের একটি পাতা ধরিয়ে দেয়। একটি সংবাদ দেখি, জাপানের কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় ভাষার বিষয়ে। বাংলাদেশের মতই এক-ভাষা এক-সংস্কৃতির দেশ মনে হলেও জাপানেরও রয়েছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র। জাপানের সর্ব উত্তরের দ্বীপ হোক্কাইডো, আয়তনে বাংলাদেশের সমান। সেই দ্বীপের আদিবাসীদের নাম আইনু, যারা এস্কিমোদের সমগোত্রীয়। বাংলাদেশের আদিবাসীরা পশ্চিম থেকে আসা আর্যদের আগ্রাসনে যেমন ক্রম বিলুপ্ত, আইনুরা তেমনি দক্ষিনের প্রধান দ্বীপ হনসু থেকে আসা জাপানী বসতি স্থাপনকারিদের চাপে বিলুপ্ত প্রায়। সেই সাথে বিলুপ্ত হতে চলেছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। বর্তমানে মাতৃভাষা জানে এমন আইনু আছে মাত্র পনেরো জন। আইনু ভাষা ছাড়া আরো সাতটি ভাষা জাপান থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবার পথে, যে গুলোর নাম য়ায়েয়ামা, য়োনাগুনি, ওকিনাওয়া, কুনিগামি, মিয়াকো, আমামি, ও

হাচিজো। এর মধ্যে হাচিজো ভাষাটি টোকিওর নিকটবর্তী হাচিজোজিমা দ্বীপবাসীর ভাষা।

শহীদ মিনারটিকে খুঁটিয়ে দেখছে সেই জাপানী উপস্থাপিকা। তাকে বলি, সবাইকে তো মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, এ ব্যাপারে তুমি নিজে কতদূর বোঝো। শহীদ মিনারের মাঝের স্তম্ভটি দেখিয়ে সে বলে- এই হচ্ছে স্নেহময়ী ভাষা মা, যাকে রক্ষা করতে দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে চার সন্তান। এরা কেবল তোমাদের সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার নয়। এখানে দাঁড়িয়ে আছে আইনুদের বীর ছেলে সাকুসাইন, ওকিনাওয়া দ্বীপের সেই সব বীর ছেলেরা যাদের রক্তের বিনিময়ে গড়ে উঠেছিল মহান রিউকিউ সংস্কৃতি। ভাষা দিবসকে বুঝতে এই শহীদ মিনারটিই যথার্থ। তার কথায়, ভিন দেশের মাটিতে দাঁড়ানো শহীদ মিনারটিকে আমি ভিন্ন চোখে দেখার চেষ্টা করি। ইউনেস্কোর জরিপে, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ভাষা মরতে বসেছে পাক-ভারত উপমহাদেশে, আমাদের প্রতিবেশী দেশে গুলোতে। সেই ভাষার সংখ্যা একটি দুটি নয় প্রায় দুইশত। মুষ্টিমেয়র ভাষা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা শুধু বাংলা ভাষার জন্য নয়, হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বৈদিক সংস্কৃত থেকে জন্ম নেওয়া পাঞ্জাবী, সিন্ধি ভাষার জন্যেও। ইতিহাসের রক্তাক্ত পথ বেয়ে বাংলা ভাষা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু উর্দুর প্রতাপে পাঞ্জাবী বা সিন্ধি ভাষা কি টিকে থাকতে পারছে? এই শহীদ মিনারে ভাষা মায়ের পাশে তাহলে কি আজ পাঞ্জাবী ভাষী ছেলেটাও এসে দাঁড়ালো! তোমাদের দেশের আদিবাসীরা কি শহীদ মিনারে ফুল দেয় ? আমাকে আনমনা দেখে প্রশ্ন করে জাপানী বন্ধু। আমার উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠে না। সাঁওতালরা কি শহীদে মিনারে ফুল দিতে আসে?

আজকাল প্রবাসীদের কর্মকান্ড জানার সহজ উপায় বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাল পত্রিকাগুলো। পৃথিবীর রাজধানী হিসেবে খ্যাত নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাল পত্রিকা থেকে জানতে চেষ্টা করি সেখানে কিভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হলো। প্রবাসের অনেক সংগঠনকে শহীদ মিনার নির্মাণ করে পুষ্প অর্পণ করতে দেখি। তবে, ব্যানারের লেখাটি ছাড়া তার আন্তর্জাতিক চেহারা খুব একটা চোখে পড়েনা । ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়াতে কম বেশী একই অবস্থা দেখি। বিগত দুই হাজার আট সালের ডিসেম্বরে শান্তির জন্য, সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃতির সংলাপকে উৎসাহিত করার জন্য, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পক্ষে ঘোষণা দিয়েছে জাতিসংঘ । মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রবাসীদের অনুষ্ঠানগুলিতে সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃতির সেই সংলাপ খুব একটা দেখি না। বার বার চোখ আটকে যায় শহীদ মিনারে।

একুশে ফেব্রুয়ারী এক মহান দিন। শুধু দিনের আলোয় কিন্তু দিনকে বোঝা যায় না, তাকে বুঝতে হয় বস্তুর উপরে পতিত আলোর প্রতিফলনের মাধ্যমে। দিনটিকে বোঝার জন্য একটি প্রতীক, একটি মিনার তাই হয়তো একান্ত অপরিহার্য। এই শহীদ মিনার যুক্তরাজ্যে তৈরী হয়েছে, জাপানে তৈরী হয়েছে, মিনারের আকৃতিতে না হলেও স্মারক স্তম্ভ হিসেবে তৈরী হয়েছে অষ্ট্রেলিয়াতে। একটি জোয়ার এসেছে, এর পরের শহীদ মিনারটি তৈরী হতে যাচ্ছে কানাডায়। তবে, শান্তির জন্য নিবেদিত একটি দিনকে দেখার জন্য যদি প্রতীকি মিনার অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তাহলে সেই মিনারটিকেও একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড় করানো দরকার। বিদেশের মাটিতে শহীদ মিনার তৈরী হলে তা কেবল বাংলা ভাষা নয়, সেই দেশে যে সব ভাষা প্রচলিত কিংবা যে সব ভাষা বিপন্ন, সে সব ভাষার জন্যেও প্রতীকি হওয়া আবশ্যক। সে সব ভাষা ভাষীরা যেন বুঝতে পারে যে শহীদ মিনারের স্তম্ভে এই যে মাকে ঘিরে সন্তানেরা দাঁড়িয়ে আছে, এখানে সব দেশের, সব জাতির সন্তানেরা রয়েছে। একুশের গান কোন বিশেষ জাতির গান আর নয়। কানাডার আদিবাসীদের ইনুকটিটুট ভাষায় সীল মাছ শিকারের গান থেকে শুরু করে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের পিজানজারা ভাষায় গাওয়া কুনিয়া আর লিরুর যুদ্ধের গান- এ সবই একুশের গান। এতদিন আমরা একটি বিশেষ জাতির ভাষা শহীদদের স্মরণে গান গেয়েছি, এখন সবাই মিলে পৃথিবীর সব ভাষার জন্য গান গাইবার পালা। বিশেষ করে সেই সব ভাষা যা বিলুপ্ত হবার পথে। সভ্যতার ইতিহাসেরও আগে, স্বপ্ন-সময় থেকে মায়ের মুখের ভাষা শিখে এত দূর এসেছে মানুষ । সেটা রাষ্ট্র ভাষা না হতে পারে, তার লিখিত রূপ নাও থাকতে পারে, তবু সেটা মায়ের ভাষা। এর জন্য নতুন সংলাপ শুরু করা প্রয়োজন।

আমাদের ছেলে সুভাষ বোস মুক্তির কথা বলতে সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে গিয়েছিলো, সেই থেকে শুরু হয়েছিলো বৃটিশ সম্রাজ্যের সূর্যাস্ত। আমাদের ছেলে এম এন রায় অধিকারের কথা বলতে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে সূদুর মেক্সিকো গিয়ে শুরু করেছিলো সাম্যবাদের আন্দোলন । তাদের প্রেরণাকে পাথেয় করে, একুশ শতকে শান্তির জন্য সংস্কৃতির সংলাপ নিয়ে আমাদের পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির কাছে যেতে হবে। মাতৃভাষা দিবসের সেই আন্তর্জাতিক প্রভাত ফেরি শহীদ মিনারের দিকে নয়, শহীদ মিনার থেকে যাত্রা শুরু করুক।